# তাহলে কি এ রকমই চলবে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

না, চলবে না। এভাবে চলা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। ১৩-১৪ কোটি লোকের নিশ্চয়ই একটা ভবিষ্যৎ আছে। তারা মানবসম্পদে পরিণত হবে কী হবে না সেটা কোনো বিবেচনা নয়, তারা যে অবশ্যই মানুষ হিসেবে, মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সে জন্যই বলতে হয় যে, ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই একটা আছে এবং সেটাকে এখনকার চেয়ে ভালোই হতে হবে, নইলে আবার ভবিষ্যৎ কী? তবে আমাদের জন্য সমস্যা যে বহু, সে ব্যাপারে মতবিরোধের অবকাশ একেবারেই নেই। এদের ভেতর অন্তত তিনটি সমস্যা বেশ প্রকট-যাদের মীমাংসার ওপর আমাদের সমষ্টিগত ভবিষ্যতের অনেকটাই নির্ভর করছে বলা যায়। একটি হচ্ছে বেকারত্ব, দ্বিতীয়টি প্রকৃতির বিরূপতা, তৃতীয়টি মাতৃভাষার চর্চা। বাইরে থেকে মনে হবে এরা বোধ করি বিচ্ছিন্ন, একটির সঙ্গে অপরটির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু আসলে সমস্যা তিনটির একটি অপরটির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তিনটিরই উৎস ও সমাধান যে এক জায়গাতেই রয়েছে, তাও একটু পরিষ্কারভাবে দেখলেই ধরা পড়বে। সমস্যার উৎস হচ্ছে দেশপ্রেমের অভাব এবং সমাধানের জন্যও যেতে হবে ওই দেশপ্রেমের কাছেই, অন্য কোথাও নয়।

সমস্যা তিনটি খুবই জাজ্বল্যমান। বেকারত্ব বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা বটে, যদিও দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের জন্যই বর্তমানে আমরা জগদ্বিখ্যাত। কেননা সন্ত্রাস তো অবশ্যই দুর্নীতি ও বেকারত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বেকার যুবক ছিনতাই করে, মানুষ খুন করার জন্য ভাড়া খাটে, মাদকাসক্ত হয়, ধর্ষণকে বিনোদন ভাবে; তার কাছে তার নিজের জীবন মোটেই মূল্যবান নয়, অন্যের জীবনকেও তাই সে কানাকড়ি মূল্য দেয় না। দুর্নীতির পেছনেও বেকারত্ব কার্যকর বৈকি। চাকরিবাকরি-ব্যবসাবাণিজ্য, বলপ্রয়োগ, অপরাধ করা এবং অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া সব কার্যকলাপেই জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। কর্মসংস্থানের এই ভয়ঙ্কর সমস্যাটাকে শাসকশ্রেণী গুরুত্ব তো দেয়ই না, বরঞ্চ বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দায়ী থাকে।

বেকার সমস্যার সমাধান হবে না যদি দেশপ্রেমের অভাব আমরা না ঘোচাতে পারি। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশী পণ্য ব্যবহার, উৎপাদনকে উৎসাহ দান, চোরাচালান প্রতিরোধ-এসব কখনোই ঘটবে না যদি না দেশপ্রেম থাকে। বাজার ছেয়ে যাবে বিদেশী পণ্য, দেশের উৎপাদক শ্রেণী নিগৃহীত হবে এবং তারাই সম্মান লাভ করবে, যারা বিদেশী কোম্পানির এজেন্ট কিংবা সেবক। উৎপাদন এ দেশে কখনোই উৎসাহ পায়নি, যারা উৎপাদন করে তাদের যে চাষা-জোলা-কামলা-মজুর ইত্যাদি বলা হয়েছে সেটা তাৎপর্যহীন নয়। দেশী ভদ্রলোকেরা কখনোই তাদের দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, এখন আমাদের দেশকে যারা শাসন করেন তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎকে তারা যত বেশি পরিমাণে বিদেশীদের কাছে বন্ধক রাখতে পারেন, ততই নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন। সমস্যাটা তাই বাড়ছেই, কমছে না।

ওদিকে প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যে দুর্ব্যবহার করছি তার প্রতিফল এখন হাতেনাতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে। সারা বিশ্বেই ঘটছে প্রতিশোধ নেওয়ার এই ঘটনা। ঘটছে বাংলাদেশেও। খাল-বিল-নদী-নালা শুকিয়ে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। আমরা পীড়িত লাগাতার বন্যায়। তার সঙ্গে থাকছে খরা। প্রকৃতির আসল শত্রু অবশ্য মানুষ নয়, আসল শত্রু পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করে, প্রকৃতিকেও রেহাই দেয় না। পুঁজিবাদ ভোগবাদিতাকে নিরন্তর উত্তেজিত করতে থাকে, তাতে জ্বালানির ব্যবহার, বর্জ্য ফেলে পানি দূষিতকরণ, অরণ্যকে উজাড় করা-সব ধরনের অপতৎপরতা চলতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বাড়তে থাকে, মারণাস্ত্র তৈরি হয়। মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, কেবল যে বোমা ফেলে তা নয়, বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর যে অস্ত্র, ধরিত্রীকে তপ্ত করা, সেই অস্ত্র ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে আমরা বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীনেই রয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার প্রকৃতিকে যতভাবে পারা যায় উত্ত্যক্ত করেই চলেছি। গাছ কাটছি, বনভূমি শেষ করে দিচ্ছি, নদীকে দিচ্ছি নিশ্চিহ্ন করে, সড়ক তৈরি করছি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে, বাঁধ তৈরি করছি ক্ষতিকরভাবে। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনছি। মূল কারণ ওই একই, দেশপ্রেমের অভাব। পুঁজিবাদ দেশপ্রেম বোঝে না, ব্যক্তির মুনাফা ও ভোগবাদিতা বোঝে। আমাদের

শাসকশ্রেণী পুঁজিবাদের দাসানুদাস এবং দেশের অন্যরা ওই শ্রেণীর আজ্ঞাবহ-যেমন শাসনতান্ত্রিকভাবে তেমনি আদর্শিকভাবে।

বেকারত্ব এবং প্রকৃতির বিরূপতা যে আমাদের জন্য ভয়াবহ সমস্যা সেটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মাতৃভাষার চর্চা হওয়া না হওয়াটাকে আমরা অতটা গুরুত্ব দেব কেন? গুরুত্ব দিতেই হবে, কেননা এই চর্চার ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই দেশপ্রেমের সঙ্গে যে জড়িত, এমন উক্তিতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তির সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি শিক্ষিত অথচ নিজের মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ কিংবা উদাসীন, তাকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত বলা কঠিন, দেশপ্রেমিক বলা তো একেবারেই অসম্ভব।

দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অবশ্যই বেড়েছে, কিন্তু সমানতালে মাতৃভাষার চর্চা যে বাড়ছে না, এটা একটি নির্মম সত্য। যারা যত উচ্চশিক্ষিত তারা তাদের উচ্চশিক্ষার অনুপাতেই মাতৃভাষা বাংলার চর্চায় অনাগ্রহী। প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, প্রমাণ মিলবে ব্যক্তিগত আচরণেও। উচ্চ আদালতে বাংলা চালু হয়নি, যেটা যেকোনো বিবেচনাতেই অস্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সত্য। উচ্চশিক্ষায় যে বাংলা নেই ওটা স্থূলভাবে সত্য। উচ্চ পর্যায়ের ছাত্ররা যেসব বই পড়ে কিংবা পড়তে অসমর্থ হয় সেগুলোর অধিকাংশই ইংরেজিতে লেখা। দেশে এখন ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে, তাদের সবকটিতেই বাংলা মাধ্যম হওয়া দূরের কথা, বিষয় হিসেবেও চালু নেই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামকরণেও বাংলা ভাষার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাংলা ভাষার অবস্থান নিতান্ত করুণ ও কোণঠাসা বটে।

শিক্ষিত লোকেরা এখন কথাবার্তা বলে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে। বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলে তাদের অনেককেই নিতান্ত অসহায় মনে হয়, ইংরেজি শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্যের আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তা ছাড়া বাংলা উচ্চারণ যখন করে তখন তাতে ইংরেজি টান তো থাকেই, অশিক্ষিত গ্রাম্য সুরও চলে আসে না। ভাষার ব্যাপারে তাদের নিতান্তই অশিক্ষিত বলে ভ্রম হয়, যেন দায়িত্ব নেই শিষ্টাচারের। অধিকার রয়েছে স্বৈরাচারী হওয়ার, যেন তারা দাম্ভিক জমিদার একেকজন। বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা আগামী দিনের নায়ক হবে, দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে বলে তাদের পিতামাতারা বিশ্বাস করেন এবং প্রাণপণে তাদের ইংরেজি শেখান, অর্থাৎ কৃত্রিম করেন, উৎপাটিত করেন দেশের জনজীবন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, বাস্তুহারা করে দেন মানসিকভাবে, অজান্তেই তাদের মধ্যে তৈরি করেন দেশ সম্পর্কে হীনম্মন্যতা। সন্তানদের পারলে বিদেশে পাঠান, না পারলে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ওদিকে সারা দিন ঘরের ভেতর টেলিভিশন সরব থাকে, যাতে ইংরেজি অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা চলে হিন্দি অনুষ্ঠানের সঙ্গে। নিজের দেশে পরবাসী হয়ে থাকা এসব মানুষের মধ্যে মাতৃভাষার জায়গাটা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষার এই দীনদশায় দেশপ্রেম বৃদ্ধি পাবে-এ আশা নিতান্তই দুরাশা বৈকি।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা। সে লড়াইটা ছিল পুরোপুরি দেশপ্রেমিক। উর্দু ভাষা আমাদের মাতৃভাষাকে কেড়ে নেবে, সেটা কিছুতেই আমরা হতে দেব না-এটা ছিল অঙ্গীকার। একবার ইংরেজি ভাষার ঔপনিবেশিক আধিপত্য বাংলা ভাষাকে লাঞ্ছিত করে, এবার আবার তার সঙ্গে যোগ দেবে নব্য ঔপনিবেশিক উর্দু ভাষা-এ আমরা কোনোমতেই মানতে তৈরি ছিলাম না। যে জন্য যুদ্ধ, স্বায়ত্তশাসনের নয়, স্বাধীনতারই। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটা ক্ষণিকের গান ছিল না, ছিল বুকের গভীর থেকে ভেসে আসা অঙ্গীকার ও উপলব্ধির ধ্বনি। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয়তাবাদীরা, কিন্তু তাদের জাতীয়তাবাদ যে গভীর ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাধীনতার পরে। অচিরেই তারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে জাতীয়তাবাদের ভেতরকার সমাজবিপ্লবী সম্ভাবনার টুঁটি চেপে ধরেছেন। শুরুতে ছিল আওয়ামী লীগ পরে যোগ দিয়েছে বিএনপি (ফেউ হিসেবে জুটেছে জামায়াত), এদের কারো দলগত নামই বাংলা নয় এবং এদের ভেতরেও সেই দেশপ্রেম নেই, যা থাকলে এরা গুরুত্ব দিতেন বেকারত্বের সমাধান, পরিবেশ রক্ষা এবং মাতৃভাষার চর্চাকে। এদের মূল কাজ লুণ্ঠন এবং লুণ্ঠনের ব্যাপারে ওরা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ও সহযোগী। এই নির্লজ্জ শাসকশ্রেণীর অব্যাহত ও একচ্ছত্র নেতৃত্বই হচ্ছে বাংলাদেশের পশ্চাৎপদতা ও অসম্মানের কারণ। এরা যত বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে দেশের মানুষের অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে এবং হতে থাকবে।

২.

মাতৃভাষার চর্চাকে আমরা গুরুত্ব দেব কেন? দেব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে। মাতৃভাষার চর্চা আলাদা কোনো ব্যাপার নয়, বিশেষ কোনো ক্ষেত্র নয়, এ হচ্ছে সমগ্র জাতীয় জীবনের রক্তপ্রবাহ। এই প্রবাহ যদি স্বাভাবিক না থাকে, তবে বুঝতে হবে আমরাও কেউই সুস্থ নই, অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এই ভাষা হচ্ছে আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা। আমরা শিক্ষার কথা বলি, শিক্ষাকে গুরুত্ব দিই, সেটা দিতেই হবে, কিন্তু শিক্ষা যে যথার্থ হবে না, পরিপূর্ণও হবে না, হবে না স্বাভাবিক যদি তা মাতৃভাষার মাধ্যমে না হয় সেটা মানি না। ভাষা মানুষের বিচ্ছিন্নতা দূর করে, পরস্পরকে ঐক্যবদ্ধ করে, করে ইহজাগতিক। আজ যে জঙ্গি মৌলবাদের তৎপরতা আমাদের সংস্কৃতিকে বিপদগ্রস্ত করছে তার প্রধান কারণ আমরা বাংলা ভাষার চর্চাকে বিকশিত ও উন্নত করতে পারছি না। তাকে উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলা ছিল আমাদের জন্য একটি প্রধান দায়িত্ব ও বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে আমাদের ব্যর্থতা মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পেছনে পেছনে পরাজয়ের যে ছায়া আমাদের অনুসরণ করেছে এবং বিজয়কে গ্রাস করে ফেলবে বলে হুমকি দিচ্ছে, তাকেই পরিপুষ্টি দিয়েছে। ভাষা হচ্ছে গণতান্ত্রিক, সে ধর্ম মানে না। শ্রেণী মানে না, আঞ্চলিক বিভেদকে অগ্রাহ্য করে; আজ যে দেশে গণতন্ত্র নেই এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নিতান্তই অনুপস্থিত, সেই দৈন্য মাতৃভাষার চর্চায় আমাদের পিছু হটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

খুব একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা। দেশে সৃষ্টিশীলতা যে নেই তা নয়। আছে। ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, উদ্ভাবন, সৃষ্টি এসব অনেকেই করছেন। কিন্তু কোনো সৃষ্টিই ব্যক্তি একা করে না, করে অনেকের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে। মাতৃভাষা ওই সমষ্টিগত হওয়ার ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে অন্য ভাষার ভেতর দিয়ে সৃষ্টিশীলতার চর্চার ব্যবধানটাকে টবের গাছের সঙ্গে মাটির গাছের পার্থক্যের তুলনা করাটা কৃত্রিম হবে না। বিশ্বায়ন আজ পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলছে, এটা হচ্ছে পুঁজির আগ্রাসন বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে; এ আগ্রাসন স্থানীয় সংস্কৃতি ও উৎপাদনকে পারলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী একটি জঙ্গল ও জংলিপনার সৃষ্টি করতে চায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে মাতৃভাষার সাহায্যেই দাঁড়াতে হবে। বিশ্বকে আমরা উদ্যান হিসেবে দেখতে চাই, জঙ্গল হিসেবে নয়।

আজকের দিনে বাংলাদেশে বাংলার যে হীনদশা তার তাৎপর্যগুলো খুবই স্বচ্ছ। প্রথম কথা, যতই আমরা বাগাড়ম্বর করি, দেশে এখন দেশপ্রেমের ভীষণ অভাব। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবিচার সে কথাই নীরবে বলে যাচ্ছে, আমরা শুনছি না। বলছে এই কথাও যে, এই রাষ্ট্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি বাংলা যাদের মাতৃভাষা, বলতে সমাজ ভীষণভাবে শ্রেণীবিভক্ত এবং বাংলা চালু আছে শুধু সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে, সর্বোপরি বলছে এটাও যে, এ দেশ মোটেই স্বাধীন নয়, রয়েছে সে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অধীনে, যার ভাষা বাংলা নয়, ইংরেজি বটে।

একটা কথা বলা হয় যে, বাংলা ভাষার চর্চা করতে গেলে আমাদের পক্ষে বিপদ আছে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে পড়ার। এত বড় অসত্য ভাষণ আর হয় না। বাংলা ভাষার চর্চা করলে আমরা মোটেই কূপমণ্ডুক হব না, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক হব। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সারা বিশ্বের যত অর্জন সবটা অনুধাবন, অনুবাদ ও রচনার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করে নেব এবং সেই আহরণটা একদিকে যেমন হবে গভীর ও সৃজনশীল, তেমনি আবার হবে সর্বজনীন। জ্ঞান ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, পরিণত হবে সমষ্টিগত সম্পদে। আমরা খাড়াখাড়ি ওপরের দিকে ওঠে যাব না, অন্যকে খাটো করে নিজে বড় হব না, আমরা ছড়িয়ে যাব আড়াআড়ি, উন্নত হব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, এদের উন্নতি পুষ্ট হবে বহুর উন্নতির দ্বারা। বহুর উন্নতি বৃদ্ধি পাবে একের পর একের সংযোজনে। বিশ্বকে আমরা গ্রহণ করব কী করে যদি গ্রহণ করার ক্ষমতাই না থাকে? যে ব্যক্তি কেবল তরল খাদ্যের ওপর বেঁচে থাকে, শক্ত খাবার দেখলে ভয় পায়, তাকে আর যাই হোক সুস্থ বলা যাবে না। হীনম্মন্যেরা সৃষ্টি করবে কী করে, তারা তো সর্বদাই অবনত।

বলা হয় যে ইংরেজি জানি না বলেই আমরা পিছিয়ে আছি। যেন চীন, জাপান, ফরাসি, জার্মান-এরা পিছিয়ে রয়েছে ইংরেজি ভাষার কাছে দাসখত লিখে দেয়নি বলে। বলা হয় যে, ইংরেজি না জানার জন্য আমরা বিদেশে চাকরি পাই না। যেন বিশ্বের নানা দেশে আমাদের যে মানুষেরা শ্রমিকের কাজ করে তারা ওইসব দেশে গিয়ে সেখানকার ভাষা রপ্ত করতে পারেনি। এসব সমালোচকরা ভুলে যায় যে, ১৩-১৪ কোটি লোককে কাজের খোঁজে আমরা বিদেশে পাঠাতে পারব না, তাদের জন্য কর্মসংস্থান দেশের ভেতরই করতে হবে এবং সেই সংস্থানের জন্য ইংরেজি ভাষা লাগবে না, লাগবে দেশপ্রেম, যা শক্তিশালী হতে পারে অন্য ভাষা নয় মাতৃভাষার মাধ্যমেই। আর

আধুনিকতা? পরানুকরণকারীদের পক্ষে বানর হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয় এবং যে মানুষই নয়, সে আবার আধুনিক হবে কোন অলৌকিক উপায়ে?

৩.

তাহলে সমাধান কী? যে দেশপ্রেম অত্যাবশ্যক এবং যার অভাবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না, কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছি, তাকে পরিপুষ্ট করব কীভাবে? কাজটা ব্যক্তিগতভাবে হবে না, করতে হবে সমষ্টিগতভাবে। বিশেষ করে দরকার যে মাতৃভাষার চর্চা তার জন্য সামাজিক উদ্যোগ চাই, কিন্তু সে উদ্যোগ মোটেই রাজনীতি-নিরপেক্ষ হবে না, তাকে হতে হবে রাজনীতি-সমর্থিত। রাজনৈতিক অঙ্গীকারের আবশ্যকতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সে অঙ্গীকার অত্যাবশ্যকীয় বটে। কেননা, রাষ্ট্রের হাতেই রয়েছে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি এবং রাষ্ট্রই হচ্ছে পথপ্রদর্শক ও নিয়ন্ত্রক। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা তথা দেশপ্রেমের ক্রমাবনতির জন্য দেশের শাসকশ্রেণী যতটা দায়ী ততটা আর কেউ নয়।

এই শ্রেণীকে বাধ্য করা দরকার কর্মের সংস্থান বৃদ্ধি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি মাতৃভাষার চর্চার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে। এদের দলীয় ও নির্বাচনী ইশতেহারে ওসবের স্পষ্ট উল্লেখ রাখার জন্য চাপ দেওয়া চাই। তা চাপ না হয় দিলাম; প্রতিশ্রুতিও দিল, কিন্তু এরা তো প্রতিশ্রুতি দেয় রক্ষা করার জন্য নয়, ভোটে জিতে সব প্রতিশ্রুতি লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার জন্যই।

হ্যাঁ, চাপ জনমত সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাংলাদেশে আজ যা দরকার তাহলো বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি, যারা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক, যারা মানুষকে মূল্য দেবে এবং সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করবে না। এই শক্তি বর্তমানে দুর্বল, কিন্তু একে গভীর ও বেগবান করার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সে লক্ষ্যেই কাজ করা আবশ্যক। বিকৃতি স্বাভাবিক নয়, স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ও ধারাবাহিক অনুশীলন চাই। সেখানেই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ভরসা নিহিত।